Vol. 47 | No. 2 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ঢোঁড়াই চরিতমানস'-এ নিম্নবর্গের জীবন

Volume	47
Issue	2
Year	2006
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Hosne Ara
Published online	February 1, 2006
DOI	10.62328/sp.v47i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i2.3
Pages	41-64
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

‘ঢোঁড়াই চরিতমানস’–এ নিম্নবর্গের জীবন

হোসনে আরা*

বাংলাসাহিত্যের আধুনিক যুগে গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা – প্রতিটি শাখাতেই নিম্নবর্গের মানুষ ও তাদের জীবন শিল্পরূপ পেয়েছে। বাংলাসাহিত্যের প্রথম উপন্যাস প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ (১৯৫৮)– এর আকর্ষণীয় চরিত্র নিম্নবর্গীয় এক মানুষ ঠক চাচা (যদিও নেতিবাচক চরিত্র হিসেবেই তার উপস্থাপনা)। পরবর্তী সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কিংবা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রাধান্য না পেলেও কাজী নজরুল ইসলাম থেকে সমকাল পর্যন্ত প্রায় সব ঔপন্যাসিকের রচনাতে প্রাধান্য পেয়েছে নিম্নবর্গের চরিত্র।

লেখকের লেখক, পাঠকের লেখক নন– এ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে বাঙালি পাঠক সমাজ যাঁকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রেখেছেন, সেই শক্তিমান কথাসাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী ঢোঁড়াই নামক চরিত্রকে উপজীব্য করে সমাজের সেই ধরনের মানুষের জীবনকেই চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন যারা সামাজিক, অর্থনৈতিক যে কোনো বিচারেই দ্বিধাহীনভাবে নিম্নবর্গের বলে চিহ্নিত হতে পারে। উল্লেখ্য যে, আন্তোনিও গ্রামসি ‘সাব অলটার্ন’ শব্দের মাধ্যমে তাদেরকেই বুঝিয়েছেন যারা শ্রেণী, বর্ণ, বয়স, পেশা কিংবা যে কোনো বিচারেই সমাজে মর্যাদাহীন।

তুলসী দাসের ‘উত্তর রামচরিত’ এর সংগঠনকে ব্যবহার করে সতীনাথ ভাদুড়ী নির্মাণ করেছেন তাঁর এই অসামান্য উপন্যাস।[১] মহাকাব্যের আঙ্গিকে রচিত এ উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় মানুষের স্বপ্ন ও সংগ্রামের এক অসাধারণ চিত্র নির্মিত হয়েছে। সুবৃহৎ এই উপন্যাসের সুবিশাল ক্যানভাসে শ্রেণী, অর্থ, মর্যাদা— সবদিক দিয়েই যারা নিম্নবর্গ, তাদের জীবনকথার অনুপুঙ্খ বর্ণনাই তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিহারের এক অনুন্নত শহর জিরানিয়ার ততোধিক অনুন্নত শহরতলির তাৎমা ও ধাঙড়টুলির মানুষের জীবনযাপন, রীতি–নীতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে উপন্যাসের প্রথম চরণে[২]; দ্বিতীয় চরণে সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে বিসকান্ধা গ্রামে তন্তিমাছত্রি বা কুশবাহাছত্রি কৃষিজীবী ভূমিকেন্দ্রিক প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রামের ছবি এঁকেছেন লেখক।

কেবল নিম্নবর্গের মানুষের জীবন-জীবিকা, অভাব অনটনের দুঃসহ বিবরণ, অপরাজেয় সত্তা বা চিরন্তন সংগ্রামশীলতার প্রতিচ্ছায়াই নয়, তাদের আচার-আচরণ,

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

তাদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, গৃহস্থালির বিবরণ, তাদের রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস সর্বোপরি সকল বিসদৃশ চিন্তা-চেতনার স্পষ্ট দলিল হিসেবে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের সার্থকতা সুবিদিত। সতীনাথ ভাদুড়ী এ উপন্যাসে একই সঙ্গে সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতাত্ত্বিকের ভূমিকা পালন করেছেন। উপন্যাসের কাহিনীস্রোতে একটি নিম্নবর্গ জনপদের ভূ-নৃতাত্ত্বিক পরিচয় শিল্পিত হয়েছে। বিহারের 'জীর্ণারণ্য' বা জঙ্গলসদৃশ শহর জিরানিয়ার শহরতলি এ উপন্যাসের পটভূমি। শহর থেকেও মাইল চারেক দূরে তাৎমাটুলি ও ধাঙড়টুলির অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর প্রতিদিনের এবং চিরদিনের জীবনসংগ্রাম, জীবনাচরণ, জীবনাভিজ্ঞতা এ উপন্যাসের মাধ্যমে পাঠকের মনোজগতে স্থান পেয়েছে। ঔপন্যাসিক একজন পরিণত নৃতাত্ত্বিকের মতোই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবন বিশ্লেষণ করেছেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে।

বিহারের জিরানিয়া শহরের উপকণ্ঠে দুই বিশেষ সম্প্রদায় তাৎমা ও ধাঙড়দের আবাস। তাৎমাটুলির সন্তান ঢোঁড়াইয়ের জন্মগ্রহণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সূচনা, তার বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর এগিয়ে চলা, জীবিকার্জন ও পরিণয়ের সূত্রে দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনার সৃষ্টি এবং বিশ্বাসভঙ্গের বেদনায় ঢোঁড়াইয়ের তাৎমাটুলি ত্যাগ করার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি। বিসকান্ধার গ্রামীণ সমাজে ঢোঁড়াই-এর উপস্থিতির মাধ্যমে শুরু উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড। ১৯৪৭ পূর্ববর্তী সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে ঢোঁড়াই চরিত্রকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে ঔপন্যাসিকের নৃতাত্ত্বিক মনোভঙ্গি প্রধান হলেও, দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাধান্য পেয়েছে মূলত তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

'ঢোঁড়াই চরিতমানস' উপন্যাসের নামচরিত্র ঢোঁড়াই তাৎমাটুলির সন্তান– সে সূত্রে এ উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে মূলত তাৎমাটুলির জীবনচিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। তবে নিম্নবর্গীয় মানুষের সামগ্রিক চিত্র ফুটে ওঠেনি তাৎমাদের জীবনকথায়। সে অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতা দেবার জন্যই ঔপন্যাসিক ধাঙড়টুলিকে তাৎমাটুলির বিপরীত কোটিতে স্থাপন করেছেন। এ কারণেই তাৎমারা কেবল নিম্নবর্গের মানুষ নয় বরং এক বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। ঔপন্যাসিক তাৎমাদের জীবনে প্রবেশের প্রাক্-কথন হিসেবে তাৎমাটুলির স্কেচ টেনেছেন কলমের কয়েক টানে। তাঁর রচনায় আদি অকৃত্রিম তাৎমাটুলির বিবরণ এরূপ—

> তাৎমাটুলিতে ঢুকতে হবে পলতেমাদারের ডাল থেকে মাথা বাঁচিয়ে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার বাইরের দুর্গন্ধটা ঢেকে যায়–শুকনো পাতা পোড়ার গন্ধে। খড়ের ঘরগুলো বাঁকা নড়বড়ে–দেশলাইয়ের বাক্স পায়ের তলায় চেপ্টে যাবার পর ফের সোজা করবার চেষ্টা করলে যেমন হয় তেমনি দেখতে। ফরসা কাপড় পরা লোক দেখলে, এখানকার কুকুর ডাকে; কোমরে ঘুনসি বাঁধা ল্যাংটা ছেলে ভয়ে ঘরের

> ভিতর লুকোয়; বাঁশের মাচার উপর যে কঙ্কালসার রুগ্ন বুড়োটা ল্যাংটো হয়ে রোদ্দুরে শুয়ে থাকে, সে-ও উঠে বসতে চেষ্টা করে আদাব করবার জন্য। মেয়েরা কিন্তু একটু অন্যরকম। এর বাড়ির উঠোনে আর ওর বাড়ির পিছন দিয়ে তো যাওয়ার পথ। ধোঁদলের হলদে ফুলে ভরা একচালাটার নিচে যে মেয়েটা তামাক খাচ্ছে, সে না হুঁকোটা নামায়, না চিরকুট কাপড়খানা সামলে গায়ে দেবার চেষ্টা করে। ইদাঁরাতলার ঝগড়া সেইরকমই চলতে থাকে, কেউই ভ্রূক্ষেপও করে না; তেলের বোতল হাতে কুঁজো বুড়িটা ফিক্ করে হেসে হয়তো জিজ্ঞাসাও করে ফেলতে পারে যে বাবু কোনদিকে যাবেন।[৩]

বর্ণনার তাৎপর্য ও মাধুর্য অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুন্দর, মুহূর্তেই পাড়াটির চলমান ছবি যেন ভেসে ওঠে পাঠকের মানসনেত্রে। পাঠক যেন কেবল পাঠক নন, একই সঙ্গে দর্শক হয়েও সশরীরে অবস্থান করেন সেখানে।

উপন্যাসটি ঢোঁড়াই-কেন্দ্রিক বলেই সম্ভবত ঔপন্যাসিকের মৌল অভিপ্রায় কেবল তাৎমাটুলির পরিচয় দেওয়া (যেহেতু ঢোঁড়াই নিজে তাৎমা সম্প্রদায়ভুক্ত)। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় কোন সম্প্রদায়ের পরিচয় তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন অন্য কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের তুলনা করা হয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় সমালোচকের অভিমত–

> One group has the stigmata of superiority and the other has those of inferiority.[৪]

-প্রাজ্ঞ ঔপন্যাসিক তাৎমাটুলির বিপরীতে ধাঙ্গড়টুলিকে স্থাপন করে তুল্যদণ্ডের নিখুঁত নিরূপণে খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছেন নিম্নবর্গীয় এই জগতের বিবর্ণ সব বৈশিষ্ট্যকে।

তাৎমাটুলি ও ধাঙড়টুলি – এই দুই টোলার মধ্যবর্তী শিমুল গাছ ভরা বকরহাট্টার মাঠ বা কোশী শিলিগুড়ি রোড বা 'পাক্কী রাস্তা' (highway) কেবল তাদের মধ্যে বিভেদ নয়, পরিবেশ ও আচরণগত এক বিরাট বৈপরীত্যও গড়ে দিয়েছে। অনুধাবনীয় লেখকের বর্ণনা–

> সবুজ বাঁশবনের পিছনে পরিষ্কার করে নিকানো ধাঙরদের খড়ের ঘরগুলো, এখান থেকেই যেন দেখতে পেতেন। অঙ্গনে, মেঠোপথে, আমগাছের তলায় খড়ের কুটোটি পর্যন্ত নেই। সব ঝকঝকে তকতকে। লোকেরা চকচকে কালো; সুন্দর স্বাস্থ্য। সেখানকার ছাগল, কুকুর, গাছ, ল্যাংটো শিশু সবই যেন তাজা নধর। এতদূর থেকেও যেন দেখা যায় তাদের কাপড় চোপড়, রাঁধবার ছাইয়ের ক্ষার দিয়ে পরিষ্কার ধবধবে করে কাচা। মাদলের শব্দ যেন কানে আসছে পিড়িং পিড়িং।[৫]

অন্ধকারকে উপলব্ধি করতে হলে যেমন আলোর প্রয়োজন, সুখকে অনুভব করতে দুঃখ, তেমনি তাৎমাটুলিকে জানতে বা চিনতে দরকার হয় ধাঙড়টুলিকে চেনা। এ দুই টোলার পার্থক্য কেবল পরিবেশগত নয়,মননগত। পরিচ্ছন্নতাকে পেশার নিগড়ে আবদ্ধ না রেখে, প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে ধাঙড়রা নতুন দিনের পথে পা বাড়িয়েছে

সর্বাগ্রে। পূর্বপুরুষদের পেশাকে সাময়িকভাবে ত্যাগ করে পাক্কী রচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সময়োপযোগী পদক্ষেপ তাদের জীবনে যে সাময়িক সচ্ছলতা এনেছে তাৎমারা তা থেকে পিছিয়ে ছিল। তাৎমাদের দৈনন্দিন জীবনের সচেতনতা ও বিশৃঙ্খলা সামঞ্জস্য রেখেছিল ভাবনার জগতেও। বাঁধা পথে হোঁচট খেয়ে চলতে তারা বিব্রত, তবু স্বচ্ছন্দে পাক্কী তৈরির কাজে হাত লাগানোতে তারা নারাজ, এমন কি এ কাজ থেকে বিরত রাখতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছে তাদের পল্লীতে।

বাংলাদেশের বহু ব্রাত্য সম্প্রদায়ের মতো তাৎমারাও নানা সংস্কার ও নিয়মনীতির ছকে বাঁধা পথে জীবনকে ধারণ করেছে। লেখকের বর্ণনায় তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট–

> তাৎমাটোলার লোকেরা বলে – রোজা, রোজগার, রামায়ণ– এই নিয়েই লোকের জীবন।[৬]

এ কথা কেবল মুখে উচ্চারিত হয় না, আন্তরিক বিশ্বাসে হৃদয়ে লালন করা হয় গভীরভাবে। অসুখে বিসুখে বিপদে আপদে এদের দরকার রোজার। রোজাকে এরা বলে গুণী। তাৎমা ও ধাঙড়দের আছে ভয়ংকর রেবণগুণী – যে কি না নানা মন্ত্র জানে, লোকের ভাল ও খারাপ করবার দ্বিমুখী ক্ষমতা যার মধ্যে বিদ্যমান; মন্ত্রের জোরে(!) সে বাঁচিয়ে তোলে মৃতপ্রায় ঢোঁড়াইকে, আবার রামিয়াকে বশীভূত করতে সে মন্ত্রপূত মাটি দেয় ঢোঁড়াইকে – তবে অবশ্যই যথোপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। লোকের মনে ভীতির জন্ম দেয়াই তার জীবিকার্জনের একমাত্র উপায়। কলোনিয়াল সমাজে কপট ধর্মনেতারা যেমন নানা অলৌকিক ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে জনগণকে কেঁচো সদৃশ করে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে তোলে, তাৎমাটুলির রোজার ভূমিকাও নিঃসন্দেহে তদ্রূপ।

তাৎমারা রোজগার করে ঘর মেরামত আর কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ করে। জিরানিয়ার অধিকাংশ বাড়ির চালই টালির, আর কুয়ো আছে প্রতি বাড়িতেই। মেয়েরা তুলো, ঘাস প্রভৃতি সংগ্রহ করে শুকিয়ে বিক্রি করে। বোঝা যায়, জীবিকা তাদের অনিয়মিত। যুগের পরিবর্তনের স্রোতে তাল মিলিয়ে শহুরে লোকেরা টিনের ঘর তৈরি করলে, টিউবওয়েল বসালে তাৎমাদের প্রয়োজন ফুরায়–তাৎমারা তাদের পূর্বপুরুষের পেশা ছাড়তে বাধ্য হয়। নতুন যুগের সন্তান ঢোঁড়াই যখন ধাঙড়দের সঙ্গে পাক্কী মেরামতের কাজে নামে–নিজ পাড়ার কেউ সমর্থন করে নি তাকে, উপরন্তু বিরোধিতা করেছে। বহু প্রতিকূলতা ও বিরুদ্ধ মতবাদকে ডিঙিয়ে ঢোঁড়াই গিয়েছে নতুন পেশায়, নতুন পথে। লেখাপড়া এরা জানে না, তবে রামায়ণের বিভিন্ন অনুষঙ্গ এরা স্মরণ করে কথায় কথায়। অন্যদিকে তাৎমা ও ধাঙড় উভয় সমাজেই আছে পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের মোড়ল, নায়েব, ছড়িদার–এরাই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, শাসন ও শোষণ করে; যদিও এদের সমাজে যারা শাসক-দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাদেরও অবস্থান নিম্নবর্গেই।

ধাঙড় সমাজের মহতো শনিচরা– একজন খেটে খাওয়া অসচ্ছল মানুষ। সামাজিক বিধান যেমন সে উচ্চারণ করে, তেমনি জীবিকার প্রয়োজনে সকলের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে 'পাক্কী' মেরামতের কাজও করে। তাৎমা সম্প্রদায়ের মহতো ধনুয়া- যার সামান্য ইঙ্গিতে ঢোঁড়াইয়ের ঘর পুড়ে যায়, সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে যার বিধান মানতে বাধ্য, সেও নিম্নবর্গেরই অন্তর্ভুক্ত, বাইরের কেউ নয়। তার স্ত্রী কন্যাকেও অন্যান্য মেয়েদের মতো ধান কাটতে যেতে হয় দূরদেশে; তাকেও ঢোঁড়াইয়ের মতো সাধারণ একজনের কাছে নিজের ছেলের মাটিকাটার কাজের জন্যে সুপারিশ করতে হয়।

তাৎমা ও ধাঙড় সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারগুলোকে ঔপন্যাসিক সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন নি, অকার্যকারিতা প্রমাণের জন্য নামচরিত্রের সংগ্রামকেও উপজীব্য করেন নি বরং নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাদের লৌকিক বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়ে একজন নৃতাত্ত্বিকের মতোই বিশ্বস্তভাবে তাদের জীবন পাঠ করেছেন। স্মরণ করা যাক নিম্নোক্ত বর্ণনাংশ –

> ঢোঁড়াইয়ের বাপের হয়েছিল জ্বর ক'দিন থেকে। নিশ্চয়ই পেয়ারা খেয়ে, কেননা সেটা বাতাবিলেবুর সময় নয়। জ্বর কী জন্যে হয় তা তাৎমাদের বলে দিতে হবে না– সবাই জানে, আশ্বিনের পরে জ্বর হয় বাতাবিলেবু খেয়ে, আর আশ্বিনের আগে জ্বর হয় পেয়ারা খেয়ে।[৭]

জ্বর হওয়ার কারণ সম্পর্কে তাৎমাদের বিশ্বাসকেই লেখক এখানে জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন; যেন এটিই সত্য – এ ব্যাপারে অন্যথার কোনো অবকাশ পর্যন্ত নেই— লেখকের কথন-ভঙ্গিতে এ ভাবটাই স্পষ্ট। তাঁর এ ভঙ্গি একাত্ম করেছে তাঁকে তাৎমাদের সঙ্গে। তিনি যেন নিজে নন, কোনো তাৎমার চোখেই দেখেছেন, অনুভব করেছেন, বিবৃত করেছেন আপন সমাজ, আপন বিশ্বাস, আপন রীতিনীতিকেই। এখানেই লেখকের স্বাতন্ত্র্য ও অনবদ্যতা।

জ্বর নয় কেবল, অনেক ব্যাপারেই তারা যথোপযুক্ত কারণ নির্বাচন করে নিজেদের বিশ্বাসের মনোভূমি থেকে এবং সে বিশ্বাসে তারা সর্বদা অটল, অবিচল। লৌকিক বিশ্বাসের সূত্রেই ধনুয়া মহতোর পঙ্গু মেয়ে ফুলঝুরিয়া তার বিকলাঙ্গতার জন্য দায়ী করে নিজেকেই। কেননা তাদের সমাজের প্রচলিত বিশ্বাসানুযায়ী গত জন্মের পাপের ফলই সে এ জন্মে ভোগ করছে। গতজন্মে হয়তো সে মহাদেবকে লাথি মেরেছিল অথবা স্বামীকে দিয়ে পা টিপিয়েছিল – তাই সে এ জন্মে খোঁড়া হয়ে জন্মেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সুবিধাবাদী স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এখানে। স্বামীকে দিয়ে পা টেপালে আর জন্মে খোঁড়া হয়ে জন্মানোর যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে ফুলঝুরিয়ার মাধ্যমে, সমাজে পুরুষদের আধিপত্য ও সুবিধাবাদী অবস্থানকে তা সুদৃঢ় করেছে।

এমনি হাজারো বিশ্বাস আর সংস্কারে আবিষ্ট তাদের জীবন। এ ধরনের বিশ্বাস প্রচলনের মূলে হয়তো আপাতভাবে কোনো কার্যকারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না, তবে গভীর অনুসন্ধিৎসায় উন্মোচিত হতেও পারে কোনো লৌকিক স্বার্থসিদ্ধির কাহিনী।

কোনো কোনো বিশ্বাস যা ঔপন্যাসিকের লেখাতে স্বাভাবিকভাবেই ওঠে এসেছে, হয়তো তাদের জীবনযাত্রায় তেমন কোনো প্রভাবই ফেলে না, তবে অর্থনৈতিক দীনতার চিত্রটি করে সুস্পষ্ট। সামান্য মসুর ডাল খাওয়ার সামর্থ্যও তাদের নেই-- এ ব্যাপারটি তাদের জীবনে সংস্কার হয়ে এসেছে; লেখকের বর্ণনায় তা স্পষ্ট –

> তার স্বামী কোনদিন মসুর ডাল খায় নি। সে কেন, কোন তাৎমাই খায় না। অত গরম জিনিস খেলে গায়ে কুষ্ঠ হয়ে যাবে সেই ভয়ে। খালি খাবে মেয়েরা ছেলে পিলে হওয়ার পর কয়েকদিন, তখনি ওদের শরীরের রস শুকানোর দরকার সেইজন্যে।[৮]

কেবল কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হবার ভয়ই নয়, নিঃসন্দেহে এর পেছনে অর্থনৈতিক দৈন্যই কাজ করেছে। তবে লেখক তা আর উল্লেখ করেন নি— যদিও পাঠক এর পেছনের সত্য সহজে খুঁজে পেতে পারে। দুধ খাওয়াটা তাদের কাছে চরম বিলাসিতা। ছেলেবেলায় ঢোঁড়াইয়ের অসুখ হলে দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন হয় কিন্তু সামান্য দুধ খাওয়ার কথা তারা স্বপ্নেও তো ভাবতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বাওয়ার ভাবনাতে তাদের আর্থিক অসচ্ছলতার প্রকৃত রূপটি স্পষ্ট হয়—

> রোগটা জানা রোগ; সবাই জানে যে, ছেলেটার হয়েছে 'বাই-উখড়ানোর' রোগ। এ রোগে পাতা শিকড়ে কিছু উপকার হয় না, তবে দুধে হয়। দুধ তো বাবু-ভাইয়াদের জন্য। তারা ' রাজা লোগ'। 'পরমাৎমা' তাদের দুধ খাবার সামর্থ্য দিয়েছেন।[৯]

করুণ ভাষায় দারিদ্র্যের বীভৎস বিবরণ নয় বরং নির্বিকার ভঙ্গিতে নিজেদের অদৃষ্টকে মেনে নেয়ার চিত্রই এখানে পরিস্ফুট। কোনো অনুযোগ, অভিযোগ কিংবা হতাশা নয় – ধনী দরিদ্রের অসাম্যকে নিম্নবর্গের মানুষেরা প্রকৃতির বিধান হিসেবেই মেনে নিয়েছে। পরমাত্মার প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস – ধনীদের প্রতি নেই কোনো ঈর্ষা, এ সব তাদের শ্রেণী অসচেতনাকেই প্রমাণিত করে।

লৌকিক বিশ্বাসও কখনও ভয়ংকর ও জীবনবিধ্বংসী হয়ে ওঠতে পারে। তার একটি প্রমাণ দৃষ্ট হয় ধাঙড় শনিচরার জীবনে। তার ঘরের লাগোয়া বাঁশঝাড়ে ফুল ধরার সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ঘটনায় ঘর, পাড়া, এলাকা ছাড়তে হয় তাদের। কারণ-

> বাঙ্গাবাঙ্গীর (ধাঙড়দের দেবতা) নির্দেশ আছে পাড়ার বাঁশঝাড়ে ফুল ফুটলেই বুঝবে যে আকাল, না হয় দুঃসময় কাছে। ঐ ফুলের ফসল ছেড়ো না । তাই দিয়ে রুটি তৈরি করে খাবে। তারপর বারো বছরের বেশি সেখানে থেকো না - বারো বার

> গাছে তেঁতুল পাকুক। তারপর তল্পিতল্পা গুটিয়ে, নতুন জায়গায় গিয়ে বসবাস করবার কথা ভাবতে হবে।[১০]

অমোঘ নিয়তির মতোই এ কুসংস্কারকে মেনে শনিচরা ও তার বৌকে গাঁ ছাড়তে হয়; কেননা ফুল যে ফুটেছে তাদের অলুক্ষণে বাঁশঝাড়ে ; অভিশাপ বয়ে এনেছে সবার জন্য। রাতের অন্ধকারে সেই বাঁশঝাড় চরম আক্রোশে কুপিয়ে কাটলেও রেহাই মেলে না তাদের। পূর্বপুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে, সমস্ত সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে নিঃসম্বল, নিঃসহায় দম্পতি পথে নামে। অশিক্ষিত নিম্নবর্গের সমাজে কুসংস্কার যে কত তীব্র আর ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, এটি তার অভ্রান্ত দৃষ্টান্ত।

পঙ্কে জন্মানো পদ্মের মতোই তাৎমাটুলিতে ঢোঁড়াইয়ের অবস্থান। পঙ্কে জন্মালেও পদ্মের সৌন্দর্য তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় না, তেমনি তাৎমাটুলির কদর্য পরিবেশে জন্মালেও ঢোঁড়াই তাঁর স্বগোত্রীয়দের মতো কূপমণ্ডুক হয়ে থাকে নি। তার চরিত্রে সত্যনিষ্ঠা এবং বিদ্রোহ প্রথম থেকেই ক্রিয়াশীল ছিল। বাবার মৃত্যুর পর বাবুলালের সঙ্গে তার মায়ের বিয়ে সে কখনও স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে নি। মায়ের প্রতি অভিমান বা বিতৃষ্ণাই তার বিদ্রোহের প্রথম সোপান। বৌকা বাওয়ার (বোবা সন্ন্যাসী) আশ্রয়পুষ্ট হলেও ভিক্ষাবৃত্তিকে সে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নি। রাস্তা তৈরির মাটি কাটার কাজে ধাঙড়টুলির শনিচরিয়াদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ঢোঁড়াই তার সমাজের প্রথা ভেঙেছে। রামিয়াকে বিয়ে করে সে তার সমাজের তুলনায় আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। সমাজের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে ভিন গাঁয়ের, ভিন গোত্রের এক মেয়েকে বিয়ে করে সে নিজ পছন্দকেই প্রাধান্য দিয়েছে। নিম্নবর্গের হয়েও সে শ্রেণীগত গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেনি। মাথা নীচু করে কোন রকমে বেঁচে থাকার স্বপ্নে বিভোর হয় নি বরং নিজ গোত্রের তুলনায় কর্মে ও চেতনায় অগ্রসর হয়েছে বহুদূর। জীবনের সকল অসঙ্গতিকে ঢোঁড়াই অতিক্রম করেছে তাৎমাটুলি ও ধাঙড়টুলির বৃহত্তর গণমানুষের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে। জিরানিয়ার শ্রমজীবী অন্ত্যজ জীবন এবং বিসকান্ধার কৃষিজীবী গ্রামীণ জীবন উভয় মাত্রাই ঢোঁড়াই চরিত্রে স্থান পেয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ী রামায়ণের রামচরিত্রের আদলে নির্মাণ করেছেন ঢোঁড়াই চরিত্র। একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে আলোকিত করার জন্যই ঔপন্যাসিক অন্ত্যজ শ্রেণী থেকে ঢোঁড়াই চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন।'ঢোঁড়াই চরিতমানস'- এর কেন্দ্রীয় চরিত্রটি প্রসঙ্গে সতীনাথ জানিয়েছেন—

> তাতমাটুলিতে ঢোঁড়াই নামে একজন লোক সত্যিই ছিল। সে একবছর আগে স্বর্গে গিয়েছে। এখানকার গ্রামাঞ্চলে ও নামটা খুব চলে। তবে তার হিন্দীতে বানান হল ঢোঢ়াই; উচ্চারণে ঢোড়হাই। বাঙালিরা নিজেদের ধরনে করে নিয়েছে ঢোঁড়াই।

> আমি বাঙলাভাষীদের ভুল নামটা নিয়েছিলাম, ওই নামের অনুষঙ্গে নির্বিষ সাপের ইঙ্গিতটুকু আনবার জন্য।[১১]

নিম্নবর্গের ঢোঁড়াই নিজ অবস্থানকে অতিক্রম করে নি,তবে আলোকিত করেছে নিজ শ্রেণীকে। একটু বড় হবার পর থেকে ঢোঁড়াই কোনো অসততা, অন্যায় বা কপটতার আশ্রয় নেয় নি, তাৎমাটুলিতে জন্মেও তাই রামায়ণজী হতে তার কোনো বাধা থাকে নি। উপরন্তু, ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে ঢোঁড়াইয়ের আপ্রাণ পরিশ্রম, সাগিয়ার পরিবারকে নিঃস্বার্থভাবে সহায়তা, বৌকা বাওয়ার প্রতি অকৃত্রিম টান এবং সবশেষে এন্টনির প্রতি অপত্য স্নেহ তাকে অনেক বেশি মানবিক করে তুলেছে। ঘৃণা ও করুণায় বিজড়িত হয়ে সমাজে যে অন্ত্যজ শ্রেণীর অবস্থান, সেই ভাবমূর্তি ভেঙে ঢোঁড়াই নিজেকে এবং তার শ্রেণীর মানুষকে প্রকৃত 'মানুষ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে ।

আলোচ্য উপন্যাসে লেখক শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়, বরং একান্তই মানবীয়বোধে আপ্লুত হয়ে নিম্নবর্গের মানুষকে চিত্রিত করেছেন, তবে তাদের শ্রেণিত্ব ঘুচিয়ে উপরের শ্রেণীতে টেনে আনার অলৌকিক কোনো গল্প ফেঁদে বসেন নি। তাই হঠাৎ করে টাকা পেলেও বৌকা বাওয়া ও ঢোঁড়াইয়ের শ্রেণিত্ব ঘুচে না কখনও। পাগলা কুকুর মনে করে বৌকা বাওয়ার উপর বন্দুক দেগে দেন উচ্চবর্গের বিজন উকিল - সে সূত্রে ক্ষতিপূরণ হিসেবে আহত বাওয়া লাভ করে সাড়ে তিনশ টাকা – সতের কুড়ি টাকা। এ পরিমাণ টাকা পাবার কল্পনা তারা কখনও স্বপ্নেও দেখে নি। বৌকা বাওয়ার কল্পনায় আকাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধির চিত্র এ রকম -

> বাড়বাড়ন্ত সংসার, ঝকঝকে নেপা উঠোন, বড় বড় কাঁচামাটির জালা দাওয়ার উপর; ঢোঁড়াইয়ের বউ রঙিন কাপড় পরে কাঁচা হলুদ সিদ্ধ করছে শুখিয়ে বিক্রি করবার জন্য, তেঁতুল গাছ জমা নিয়েছে পাঁচ টাকায়, আদা দিয়ে বড়ি দিচ্ছে, উঠোনে আমলকী আর অশথের ডগার আচার শুখোতে দেওয়া হয়েছে; সমৃদ্ধির রামায়ণের ছবিভরা পাতা, একখানার পর একখানা খুলে যাচ্ছে বাওয়ার বন্ধ চোখের সম্মুখে।[১২]

একটু সচ্ছলতা, একটু ভালভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাই তাদের কাম্য, তাদের আজন্ম লালিত স্বপ্ন। খুব সামান্যতেই তারা অনেক বেশি খুশি। নিজ শ্রেণীকে অতিক্রম করার দুঃসাহস তারা কখনও স্বপ্নেও দেখে না- নিজ শ্রেণীর অন্তর্গত হয়েই তারা নিজেদের সম্মান বা মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য লালায়িত হয়। তাইতো তারা নিজেদের তাৎমা না বলে তন্ত্রিমাছত্রি বলে পরিচয় দিতে ভালবাসে, রীতিমতো সংগ্রাম করে ব্রাহ্মণদের মতো পৈতা বা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করে – নেহায়েৎ সম্মানবৃদ্ধির তৃপ্তিতে।

তাৎমাটুলির তাৎমাদের প্রধান জীবিকা ঘরের ছাদে টালি বসানো এবং কুয়ো পরিষ্কার করা। এর বাইরে অন্য কোনো কাজ করাকে তারা ঘৃণা করে। তবে এককালে এদেরও ছিল গৌরবময় ঐতিহ্য -

> সেকালে আমাদের বাপঠাকুরদাদারা যখন কাপড় বুনত, তখন মাড় দিয়ে সুতো মাজবার সময় সবাই কানে জড়িয়ে রাখত এক এক গাছা সুতো। মাজতে গিয়ে সুতো ছিঁড়েছে কি কানের থেকে একগাছা খুলে নিয়ে ছেঁড়াটা জুড়ে দাও। পৈতা কি আর আমাদের নতুন জিনিস।[১৩]

বাংলার গৌরবময় তাঁতশিল্পীরা কালের বিতর্তনে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে কতখানি নিচে নেমে এসেছে— এ উপন্যাসে ক্ষণকালের জন্য হলেও তা ধারণ করা হয়েছে কোনো বিস্তৃত বর্ণনায় নয়, নয় করুণা-বিজড়িত কোনো উপাখ্যানে, দু'এক বাক্যেই লেখক একটি সম্প্রদায়ের গৌরবময় অতীত এবং বর্তমান দুরবস্থার ছবি তুলে ধরেছেন।

নিম্নবর্গের এ সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য প্রবল। গতানুগতিক নিয়মে তাদের সমাজও পিতৃতান্ত্রিক তথা পুরুষ প্রধান; তবে বছরে দু' মাস সেখানকার চিত্র ভিন্ন। কেননা দু' মাস অন্তত তাদের সংসার চলে মেয়েদের রোজগারে। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে তাৎমা পুরুষদের রোজগার কিছু অনিশ্চিত হয়ে আসে। তখন তাৎমা মেয়েরা যায় ধান কাটতে। বছরের দু' মাসের যে বিপরীত চিত্র তা ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন স্বভাবসুলভ তির্যকতায়-

> ঝোটহারা তখন নতুন আনা ধানের মালিক; ধরাকে সরা জ্ঞান করে। প্রতি সংসারে ঝগড়া - বিবাদ বেশ জমে ওঠে। বাড়ির কর্তাই নিচু হয়ে, এই দু' মাস 'ঝোটাহা' দের খোসমোদ করে। তাই তাৎমাটুলির মেয়েরা বলে- 'কখনও নৌকার উপর গাড়ি, কখনও গাড়ির উপর নৌকা। দশমাস পুরুষ রাজা, তো দুমাস মেয়েরাও রাজা।[১৪]

উচ্চবর্গ ও মধ্যবিত্তের সমাজচিত্রে এমনটা সম্ভব নয় (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া)। পারিবারিক নির্ভরশীলতার ছক—অনেকটা মৌসুমী হাওয়ার মতো বদল হওয়া, সম্ভবত একমাত্র নিম্নবর্গের মানুষের জীবনযাত্রাতেই সম্ভব।

'ঢোঁড়াই চরিতমানস' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে সতীনাথ ভাদুড়ী শহরতলির এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষদের অনুপুঙ্খ জীবনযাত্রা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বিসকান্ধার গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষের জীবন তুলে ধরেছেন। তবে প্রথম খণ্ডে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন অঙ্কনে লেখকের যে দক্ষতা দেখা যায়, দ্বিতীয় খণ্ডে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রাধান্যে তা খানিকটা নিস্প্রভ। দ্বিতীয় খণ্ড অনেকটা দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে উঠেছে— উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের দ্বন্দ্ব; কোয়েরীদের সঙ্গে রাজপুতদের দ্বন্দ্ব। উচ্চবর্গ কর্তৃক

নিম্নবর্গের শোষিত হবার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় এ খণ্ডে। বাবুসাহেব (বচ্চন সিং) তার অনিঃশেষ ক্ষুধায় আত্মসাৎ করে গ্রামের প্রায় সব জমি। বিধবা মোসাম্মতের জমি দখল করে কোয়েরীদেরই প্রধান গিধর মণ্ডলের সহায়তায়। ডাইনি অপবাদ দিয়ে মোসাম্মতকে গ্রামছাড়া করে তারা। এ ছাড়া শস্য কর্জ দিয়ে সাদা কাগজে টিপসই নিয়ে একতরফা ডিক্রি জারির মাধ্যমে পছন্দনীয় জমি দখলের চিরায়ত পদ্ধতিরও বিবরণ পাওয়া যায় এ খণ্ডে।

নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন এ খণ্ডে মুখ্য নয়, শ্রেণীশোষণ এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনই এখানে প্রধান। ইংরেজ বিরোধী কংগ্রেসী আন্দোলন, কিছুই না বুঝে একটু পরির্তনের আশায় নিম্নবর্গের মানুষের তাতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, রাজনীতিবিদদের অসততা – এসবই মূলত স্থান পেয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডে।

ঔপন্যাসিক এ পর্বে দেখিয়েছেন যে, নিম্নবর্গের মানুষদের অজ্ঞতার সুযোগে তারা ধূর্ত রাজনীতিবিদদের হাতিয়ারে পরিণত হয়। তাদের ব্যবহার করে ক্ষমতার শীর্ষে উঠে যায় লাড্‌লীবাবুর মতো উচ্চবর্গের শোষক শ্রেণী। ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির দরুণ এক পয়সাও সাহায্য পায় না কোয়েরীটোলা, সব রিলিফ চলে যায় রাজপুতটোলায়। কেননা তাদের পাকা ঘর, তাদেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে ভুমিকম্পে। নিম্নবর্গের মানুষেরা রাজনীতির ঘোর প্যাঁচ বোঝে না বলেই ভোটের কাগজ মহাৎমাজীর চিঠি ভেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে। তাদের ভাবনায় মহাৎমাজী রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন,

যে রামরাজ্যে দরিদ্র, দীনদুঃখী নির্বোধ বা অলুক্ষণে কেউ থাকবে না।[১৫]

এসব চিত্রই ঢোঁড়াই চরিত্রের মাধ্যমে লেখক প্রকাশ করেছেন। তবে এ চরিত্রের পরিণতি তিনি দেখান নি – ঢোঁড়াই চরিতমানসের আরও একটি খণ্ড রচনার পরিকল্পনা তাঁর ছিল।

সারাজীবন প্রতিবাদ করে ঢোঁড়াই অবশেষে জীবনের অর্থহীনতা খুঁজে পায়, নিরাসক্তভাবে আত্মসমর্পণের জন্য এগিয়ে যায়— এভাবেই ঢোঁড়াই-এর জীবননাট্যের সমাপ্তি টেনেছেন ঔপন্যাসিক।

নিম্নবর্গ এবং গ্রামীণ জীবন যেন অবিচ্ছেদ্যভাবে আসে বাংলা উপন্যাসে। সতীনাথ ভাদুড়ী ছককাটা পথে চলেন নি— তাঁর উপন্যাসে গ্রাম বা শহর মুখ্য নয়— মুখ্য কেবল নিম্নবর্গের মানুষ— এ মানুষ শহরেও যেমন নিম্নবর্গের, গ্রামেও তাই। শ্রেণীগত অবকাঠামোয় বন্দি এ মানুষের শ্রেণী উত্তরণ ঘটে না কখনও- কোনোভাবেই। 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' নিম্নবর্গের মানুষের এক অকৃত্রিম জীবনগাথা।

তথ্য নির্দেশ

১. এ প্রসঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ী নিজেই জানিয়েছেন–

> এ যুগে শ্রীরামচন্দ্র নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। এখানেই হল ঢোঁড়াই – রামের অবির্ভাব আমার মনে। এ যুগে মহাকাব্য অচল কিনা সে প্রশ্ন আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। কেননা আমার কাজ ছিল শুধু পুরনো মহাকাব্যের ফ্রেমে ঢোঁড়াই – রামকে বাঁধানো।
>
> [ঢোঁড়াই, সতীনাথ-বিচিত্রা, ১৩৭২]
>
> এছাড়া শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২' চতুর্থ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৯- এর 'গ্রন্থ প্রসঙ্গ'-এ সম্পাদদ্বয় শ্রীবিজয়কালী ভট্টচার্যের 'সচিত্র রামচরিতমানস' থেকে মূল শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, ঢোঁড়াই চরিতমানসে উদ্ধৃত তুলসীদাসের প্রায় সব সূক্তিই 'রামচরিতমানস'-এর চৌপাই বা দোহা থেকে টুকরো করে নেওয়া। সাজানোর ভঙ্গিতে সতীনাথ এ উপন্যাসে তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'কে পর্যাপ্তরূপে ব্যবহার করেছেন।

২. 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' উপন্যাসকে ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী দুটি পর্ব বা খণ্ডে রচনা করে প্রথম খণ্ডকে 'প্রথম চরণ' এবং দ্বিতীয় খণ্ডকে 'দ্বিতীয় চরণ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। আমাদের আলোচনায় ভাদুড়ীর চরণ বোঝাতে খণ্ড শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. শঙ্খঘোষ।। নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত 'সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২', কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ৩-৪
এখন থেকে উদ্ধৃতির জন্য গ্রন্থের উক্ত সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

৪. R.F. Bendict, 'Race: Science and Politics. New York, 1940, P. 5

৫. সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২, পৃ. ২

৬. সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২, পৃ. ৪

৭. সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২, পৃ. ১১

৮. সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২, পৃ. ৭

৯. সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২, পৃ. ১৪

১০. সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২, পৃ. ১২৪

১১. ঢোঁড়াই, সতীনাথ-বিচিত্রা, কলিকাতা ১৩৭২

১২. সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২, পৃ. ১১৬

১৩. সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২, পৃ. ৭১

১৪. সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২, পৃ. ৮৩

১৫. সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২, পৃ. ২১৭

'বিদ্রোহী' : তার রূপ ও মাত্রা

মার্জিয়া আক্তার*

বিংশ শতাব্দীতে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় পরিসরে উত্তর রৈবিক বাংলা কবিতায় কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) আবির্ভাব। বিপুল আবেগে ও সংবেদনায়, কবিসত্তার একনিষ্ঠ আন্তরধর্মে আধুনিক বাংলা কবিতায় তিনিই 'প্রথম স্বতন্ত্র কবি'।[১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবেশে ঔপনিবেশিক শাসন, সামন্ততান্ত্রিক নিষ্পেষণ, সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি, অর্থনৈতিক শাসন, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের প্রবল পীড়ন এবং সর্বোপরি মনুষ্যত্বের অপমান ও লাঞ্ছনায় তাঁর সত্যসন্ধ স্পর্শকাতর অন্তরচৈতন্যে প্রতিবাদী সত্তা যে তীব্র আলোড়ন তুলেছিল, নজরুলের কবিতায় তার আবেগময় ও স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়।

ইউরোপীয় রেনেসাঁলব্ধ পাশ্চাত্য বুর্জোয়া জীবনাদর্শ ও বিশ্বশিল্পসৃষ্টির সংস্পর্শে বাঙালির আধুনিক ভাব-পরিমণ্ডলে যে ইতিবাচক আবহ তৈরি হয়েছিল তারই শিল্পিত প্রকাশ নজরুল ইসলাম ও তাঁর কবিতা। নবযুগের মানবিকচেতনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁর কবিতায় যুক্ত করেছে নবতর তাৎপর্য; পুরনো ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে সমকালীন জীবনার্থ ও মানবিক অনুষঙ্গ। ঊনবিংশ শতাব্দীর অস্থির সমাজপ্রতিবেশে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) রামায়ণ-পুরাণের রাবণকে আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি চিত্তে স্থাপন করে আধুনিকতার যে জীবনবীজ উপ্ত করেছেন, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা করে তুলেছেন বিশ্বপ্রসারী । রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভাবস্পর্শী নান্দনিক শিল্পভাবনায় সমাহিত না হয়ে নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় আবির্ভূত হলেন স্বতন্ত্র বক্তব্য ও বাণীভঙ্গিমা নিয়ে। তাঁর আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কবিতার হাজার বছরের গতিস্রোত হলো ভিন্নমুখী; সে স্রোতে যুক্ত হলো অভাবিত কলধ্বনি। পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় সচেতন ভারতবাসী মুহূর্তেই জেগে উঠল 'বিদ্রোহী'র উচ্চকণ্ঠ আহ্বানে। নজরুলের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা শক্তি সংগ্রহ করেছে ফরাসি বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের ঐতিহ্য এবং শেলি, হুইটম্যান, গোর্কির সাহিত্য থেকে। স্বাধীনতাপ্রীতি ও বিপ্লবী আবেগের সমন্বয়ে তিনি শেলির যথার্থ উত্তরসূরি এবং শওকত ওসমানের ভাষায় 'গোর্কির মানসপুত্র'।[২] শিল্পের চেয়ে জীবন বড় — তা তিনি বিশ্বাস করতেন। আর তাই মার্ক্সবাদ, সন্ত্রাসবাদ কিংবা ইসলামি জাগরণের

---

* প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

পরস্পরবিরোধী চেতনায় তিনি সাড়া দিয়েছেন। তাঁর প্রতিভার এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে বাঙালি পাঠক রহস্যাকুল হয়েছে– হয়েছে দ্বিধাগ্রস্ত।

'বিদ্রোহী'[৩] নজরুলের বহুল অভ্যর্থিত কবিতা। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'বিদ্রোহী' এমনই বিখ্যাত হয় যে তা অতিদ্রুত নজরুলের নামের আগে চিরকালের জন্য যুক্ত হয়ে যায়। কবিতাটির অতিনতুনত্বে সচকিত হয়ে ওঠেন অনেকে, অনেকে আবার কবিতাটি সম্পর্কে উচ্চারণ করেন সচেতন বিরুদ্ধতা।[৪] কবিতাটির মৌলিকতা নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। মোহিতলাল মজুমদারের মতে তাঁর 'আমি' কথিকার ভাবসম্পদ চুরি করে 'বিদ্রোহী' রচিত। কিন্তু মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন, 'একবার মাত্র শুনে নজরুল তার দীর্ঘকাল বাদে মোহিতলালের 'আমি' থেকে কি করে সৃষ্টি করে তুলবেন 'বিদ্রোহী' কবিতাটি?'[৫] কবিতাটিকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয় তিক্ত-সম্পর্ক। এ উপলক্ষে উভয়ে রচনা করেন একাধিক কবিতা ও প্যারোডি।[৬]

'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল মর্মত রোমান্টিক। প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী চেতনায়, রোমান্টিক অনুভবে তিনি প্রত্যাশা করেছেন সুষম সুন্দর কল্যাণময় সমাজ। 'তাঁর রোমান্টিক কবিচিত্ত মানুষের নির্যাতন, লাঞ্ছনা, শোষণ প্রভৃতি উচ্ছেদ করতে বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ'।[৭] রোমান্টিক অনুভবমগ্নতায় সত্য, সুন্দর, মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় যাবতীয় অন্যায় ও অপশক্তির বিরুদ্ধে তিনি উচ্চারণ করেছেন বিদ্রোহের বাণী। তাঁর এ উচ্চারণ যে আকস্মিক বা বিচ্ছিন্নমূল নয় ,তা স্পষ্ট হয় তাঁর এ সময়ের কয়েকটি উপলব্ধিতে —

> ক. আপনাকে চেন। বিদ্রোহের মত বিদ্রোহ যদি করতে পার, প্রলয় যদি আনতে পার তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই, কল্যাণ আসবেই। লাথির মত যদি লাথি মারতে পার, তা হ'লে ভগবানও বুকে করে রাখে। ভৃগুর মত বিদ্রোহী হও, ভগবানও তোমার পায়ের ধুলো নেবে। কাউকে মেনো না, কোনো ভয়ে ভীত হয়ো না বিদ্রোহী। ...বল আমিই নূতন করে জগৎ সৃষ্টি করব। স্রষ্টার আসন থর থর ক'রে কেঁপে উঠুক ! বল, কারুর অধীনতা মানি না, স্বদেশীরও না, বিদেশীরও না।[৮]
>
> খ. 'পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে। আর এই বিদ্রোহ করতে হ'লে সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে,-
>
> আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ![৯]
>
> গ. আমি পরম আত্মবিশ্বাসী। তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে অন্যায় বলেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, — কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই, — আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, তার জন্যে

> ঘরে-বাইরের বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর অপর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই, লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা।[১০]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে নজরুলের বিদ্রোহ চেতনার স্বরূপ অনেকখানি স্পষ্ট। পরাধীনতার গ্লানিতে দীর্ণ হয়েছে নজরুলচিত্ত এবং এই গ্লানি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তিনি হয়েছেন বিদ্রোহী। অবশ্যই, কেবল দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনেই তাঁর বিদ্রোহীচিত্তের তৃপ্তি ছিল না — তাঁর বিদ্রোহ ছিল পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার, 'সকল আইন-কানুনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ, ইতিহাস-নিন্দিত চেঙ্গিসের মত নিষ্ঠুরের জয়গানে মুখর, ধর্মের উৎখাতে দৃঢ় সংকল্প ,ধ্বংসের আবাহনে নিরলস।'[১১] প্রতিকূল যুগযন্ত্রণায় শৃঙ্খলিত 'আমিত্ব'কে মুক্তি প্রদানের প্রয়াস থেকে উচ্চকিত ছিল তাঁর বিদ্রোহ। তবে কেউ কেউ তাঁর বিদ্রোহের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন সীমাহীন নৈরাজ্য ও হতাশা।[১২] কোন সমালোচক আবার প্রত্যক্ষ করেছেন অধ্যাত্মচিন্তা।[১৩] এ কথা অনস্বীকার্য যে নজরুলের এ বিদ্রোহ দর্শন-পরিস্রুত নয় ; বরং তা একান্তই রোমান্টিক ভাবালুতাপ্রসূত।[১৪]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে পরাধীন বাঙালি জাতিসত্তার বহুমুখী বঞ্চনা এবং তজ্জাত অসন্তোষ ও বিক্ষোভই প্রধানত উচ্চকিত হয়েছে 'বিদ্রোহী' কবিতায়। যুগ মানুষের ক্ষুব্ধ প্রতিচ্ছবি উৎকীর্ণ হয়েছে এর অবয়বে। তাঁর পরবর্তী জীবনের সমগ্র কাব্যসাধনার মৌলসূত্র এই কবিতার মর্মমূলে নিহিত। তাঁর লক্ষ্য ছিল সর্বাত্মক গণজাগরণ, বৈষম্যমুক্তি এবং পরাধীনতার চির অবসান । তাঁর কাছে মুক্তির অর্থ রাজনীতি ও শাসনের চিরাচরিত ধারার বিলোপ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, বিচিত্র ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার থেকে মুক্তি। সনাতন জীবনদৃষ্টি, প্রচলিত বিধিবিধান, সর্বপ্রকার মোহবন্ধন থেকে মুক্তির যে দৃপ্ত ঘোষণা, তা এ কবিতাকে সমকালীন কাব্যধারায় প্রদান করেছে বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্য :

বল বীর —
বল উন্নত মম শির !
শির নেহারি' আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির !
বল বীর —
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,

খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর !

... ...

আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার !
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল !

... ...

আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিশ্ববিধাত্রীর !

এ বিদ্রোহ সর্বকালের শোষক, শাসক ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধেই কেবল নয়, এ বিদ্রোহ যেন সমকালে প্রচলিত কাব্যধারার বিরুদ্ধে। জীবনানুভব ও বিশ্বাসের এমন সরব ও প্রদীপ্ত প্রকাশ সমকালে ছিল যথার্থই দুর্লক্ষ্য । উনিশ শতকীয় 'রেনেসাঁ' বা নবজাগরণের ফলে অবরুদ্ধ মানবচৈতন্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে লক্ষণ অতি ধীরে বাঙালি চৈতন্যে বিকশিত হতে শুরু করে, তা 'বিদ্রোহী' কবিতায় নবতর তাৎপর্যে সুচিহ্নিত । এ কবিতায় উচ্চারিত 'আমি' এই নবজাগ্রত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শিল্প প্রতিনিধি।"[১৫] বৈদিক ঋষির কণ্ঠে 'আত্মনং বিদ্ধি'র সুর একদিন ধ্বনিত হয়েছিল, সেই নিজেকে জানার সুর নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় উদ্ভাসিত।[১৬] আত্মানুসন্ধান, সত্যানুসন্ধান ও জীবনানুসন্ধানের যে সুতীব্র উদ্ভাসন নজরুলের কবিতাকে প্রদান করেছে লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য তা এ কবিতার নিম্নোক্ত চরণগুচ্ছে প্রতিধ্বনিত :

জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ-পাতাল- মর্ত্য !
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ !!—

বলা বাহুল্য, 'বিদ্রোহী'র এ আমিত্ব আত্মকেন্দ্রিকতার বিবরে প্রবেশ করে নি। 'বিদ্রোহী, এগিয়ে গেছে ক্ষুদ্র আমি থেকে বৃহত্তর 'আমি'ত্বে। হুইটম্যানের আমি যেমন গণতন্ত্রী আমেরিকার আত্মঘোষণা, মায়াকভস্কির যেমন সমাজতন্ত্রী সোভিয়েতের আত্মপ্রতিষ্ঠা, তেমনি নজরুলের 'আমি' দুনিয়ার শৃঙ্খলিত মানব সমাজের নির্যাতিত, শোষিত, সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি-কণ্ঠ।[১৭] আর তাই কবিতার শেষ পর্যায়ে যেখানে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল ধ্বনিত হয়েছে — সেখানে কবির ব্যক্তি 'আমি' বৈশ্বিক বেদনায় উদ্দীপ্তিত ও রূপান্তরিত । কবিতার ভাষায় —

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ- ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

এই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য উৎপীড়কের উৎখাত এবং উৎপীড়িতের মুক্তি। নজরুলের পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় নির্যাতিত-অবহেলিত মানুষের জন্য সমবেদনা প্রতিধ্বনিত হলেও সমস্যার স্বরূপ ও সমাধানের ইঙ্গিত ছিল অনুপস্থিত। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের এ শ্রেণিবিভাগটি নজরুল জেনেছিলেন মার্ক্সবাদের পটভূমিতে।[১৮] কিন্তু মার্ক্সবাদের তত্ত্বকে তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন পরম আবেগ দিয়ে।

বিদ্রোহের আবেগে বিদ্রোহী সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের সামগ্রিক উপলব্ধিতে তা ব্যাপক ও বিশাল। 'মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর হাতে রণ-তূর্য' — তাঁর রোমান্টিক মানসের এই দ্বিবিধ প্রবণতা তাঁকে কখনো করে তুলেছে দুর্জয় সংগ্রামী ও বিদ্রোহী ; আবার কখনো তিনি হয়ে উঠেছেন সৌন্দর্যপিপাসু ও প্রেমিক। আর তাই সংগ্রামের মহাঝঞ্ঝার বিপুলাবর্তে কবি বিস্মৃত হন না 'গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি', 'চপল মেয়ের ভালোবাসা', 'কাঁকন-চুড়ির কন-কন', ' প্রথম পরশ কুমারীর'; 'যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর', 'উদাস পূরবী হাওয়া'. 'উত্তর-বায়ু', 'মলয়-অনিল', 'পথিক-কবির গভীর রাগিণী' ও 'শ্যামলিমা ছায়া-ছবি'। আবেগময় এ সমস্ত শব্দ ও বাক্যবন্ধ 'বিদ্রোহী'র প্রচণ্ড মূর্তির পরিবর্তে রক্ত-মাংসে গড়া মানবমূর্তির সন্ধান দেয়। এ না হলে বিদ্রোহী হত অতিমানুষ বা অমানুষ, না হয় বড় জোর খণ্ডিত মানুষ। কবির প্রতিভা ও পরিমিতি জ্ঞান এই ভাবে বিদ্রোহীকে চিরন্তন মানুষে উন্নীত করেছে এবং কবিতাকে করে তুলেছে সার্থকতামণ্ডিত।[১৯] বস্তুত, নজরুলের এ বিদ্রোহ চেতনা ও প্রেমচেতনা পরস্পরের পরিপূরক — 'বিদ্রোহী' কবিতার উদ্দাম বিদ্রোহের সঙ্গে এর প্রেমচেতনা হয়ে গেছে একাকার। নজরুল কাব্যে এ বিদ্রোহ আর প্রেমের সমান্তরাল পথযাত্রা শেষাবধি ছিল বহমান ও অক্ষুণ্ন ।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে স্বীকরণ করে নির্মিত হয়েছে নজরুল প্রতিভা। নজরুল ইসলাম জন্মসূত্রে ভারতীয় – অপর দিকে ধর্মসূত্রে পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যের ধারক। নান্দনিক ঐকান্তিকতায় এবং জৈব সামগ্রিক ঐক্যসূত্রে এই দুই ভিন্ন উৎসের শিল্প-উপাদান নজরুল-কবিতায় সৃষ্টি করেছে মূর্ছনার একক সুর।[২০] 'পুরাণের ব্যবহার নজরুলের কাব্যে পৌরাণিক কাহিনী হিসেবে নয় — আধুনিক কবির ভাবের একটা বাহন ও প্রতীক হিসেবেই তার সার্থকতা।'[২১] 'প্রকৃতপক্ষে পুরাণের জন্ম

পুরাঘটিত এবং বর্তমান মুহূর্তের অবিচ্ছেদ্য হৃদ্যতায়।'[২২] আর তাই 'বিদ্রোহী'র প্রবল ও শক্তিমান 'আমি' পুরুষ যেমন নটরাজের সৃষ্টি ও ধ্বংসের সঙ্গে সমীকৃত, তেমনি সমকালীন ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিপক্ষে ঐ 'আমি' পুরুষ তারুণ্য ও বলদৃপ্ত নায়কের প্রতীক চিত্রে প্রদত্ত করেছে।[২৩] 'বিদ্রোহী' কবিতায় নটরাজ মিথকল্পের প্রয়োগ লক্ষ করা যাক—

ক. মহা প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধবংস
খ. আমি ধূর্জটি, আনি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর!
গ. আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর
ঘ. আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,

উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি উদ্ধৃতিতেই নটরাজ শিবের মিথকল্প উপস্থাপিত। প্রথম উক্তিতে মহাপ্রলয়ের ভীষণতা প্রকাশের জন্য নটরাজ শিবের ধ্বংসাত্মক রূপকল্প রূপকচিত্রে সমর্পিত। (খ)-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ধূর্জটিও কবির কাছে ধ্বংসের প্রতীকরূপে গৃহীত। উদ্ধৃতি (গ)-তেও কবি আপন শক্তির প্রকাশের জন্য ব্যোমকেশের ন্যায় গঙ্গোত্রী ধারাকে ধারণ করার কথা বলেছেন । আপন শক্তির বিরাঁত্ব, বিশালত্ব ইত্যাদি অর্থে ব্যোমকেশের পৌরাণিক চিত্র কল্পনা সত্যিই অসাধারণ; সর্বশেষ উক্তিতে মহাদেবের ডমরু ত্রিশূল ও ধর্মরাজের দণ্ডের সঙ্গে নিজেকে তুলনীয় করেছেন কবি, এবং অত্যাচারী শাসক- শোষকের বিরুদ্ধে দণ্ডধরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সুস্পষ্ট অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। এভাবেই প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে নজরুল মানসের শক্তিমত্ত 'আমি' পুরুষের সঙ্গে উদ্ভাসিত হয়েছে নটরাজ শিবের রূপক তাৎপর্য ।

ভারতীয় পুরাণের বহুভঙ্গিম ব্যবহার যেমন 'বিদ্রোহী' কবিতায় শিল্পসাফল্য পেয়েছে, তেমনি সমান দক্ষতায় ব্যবহৃত হয়েছে ইসলামি ঐতিহ্য নির্ভর জীবন ও প্রাসঙ্গিক শব্দচিত্র । 'একশ একচল্লিশ পঙক্তির এ কবিতাটি পুরাণ প্রয়োগের একটি Tour de force : মুসলিম, হিন্দু ও গ্রীক পুরাণ এখানে একত্রীকৃত।'[২৪] "বিদ্রোহী" কবিতায় নটরাজ-মিথ ছাড়াও নজরুলের হাতে প্রাণ পেয়েছে ভারতীয়, গ্রিক ও পশ্চিমএশীয় ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গ। যেমন—

ক. আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা -বিশ্বামিত্র- শিষ্য,
খ. তাজি বোর্‌রাক্ আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত-হ্রেষা হেঁকে চলে !
গ. ধরি বাসুকির ফণা জাপটি',
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি' !

ঘ. আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরি,
ঙ. আমি রুষে উঠি যবে ছুটি মহাকাল ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া !
চ. আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
ছ. আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা !
জ. আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার !
আমি হল বলরাম –স্কন্ধে,
ঝ. আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন !

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির অধিকাংশের মধ্যেই সেই প্রবল শক্তিমত্ত 'আমি' পুরুষকে আরো শক্তিমান করেছে পুরাণের পরোক্ষ রূপকের প্রয়োগ। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে বিদ্রোহী বীরও সামগ্রিক অন্যায় অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে দুর্বাসার ক্রোধের ন্যায় যেন ক্রোধের মূর্তিমান প্রতীকরূপে আবির্ভূত। (খ)-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে এই বিদ্রোহী এক দিকে যেমন হিন্দু-পুরাণে সমুদ্র মন্থনে উত্থিত ইন্দ্রের বাহন উচ্চৈঃশ্রবা ; অন্য দিকে তেমনি ইসলামিক পুরাণের কথিত বোররাক, স্বর্গের পঙ্খীরাজ। উদ্ধৃতি (গ)-তে হিন্দুপুরাণ কথিত যে নাগরাজ বাসুকি সমগ্র বসুন্ধরা ধারণ করে আছে, বিদ্রোহী আপন শক্তিমত্তা প্রকাশের জন্য সেই বাসুকির ফণাও জাপটে ধরেন। স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখাও সাপটে ধরেন। (ঘ)-উদ্ধৃতিতে অর্ফিয়াস যেমন তাঁর বাঁশীর সুরে নিসর্গ জগতকে মুগ্ধতার মাধ্যমে আলোড়িত করতেন, অর্ফিয়াসের বাঁশীরূপ বিদ্রোহীর বিদ্রোহ-সুর যেন তেমনি আলোড়িত করেছে সমগ্র বিশ্বকে। উদ্ধৃতি (ঙ)-তে হিন্দুপুরাণে কথিত সপ্তম নরক এবং ইসলামি পুরাণের হাবিয়া-দোজখ বা ভয়াবহ সপ্তম নরক বিদ্রোহীর প্রবল পরাক্রমে কম্পিত, নির্বাপিত প্রায়। (চ)-তে বিদ্রোহী যেন আপনাকে নিঃশেষে ধ্বংস করা চণ্ডী যে নিজের বামহস্তে নিজের মস্তক ধারণ করে লোলজিহ্বা দ্বারা স্বীয় কণ্ঠনিঃসৃত রক্তধারা পানে নিরত। (ছ)-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নজরুল মানসের গূঢ় অভীপ্সার রূপায়ণ ঘটেছে। সৃষ্টির কল্যাণে যুগে যুগে বিষ্ণু অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান পঙ্‌ক্তির যুগল কন্যা বিষ্ণুর দুই পত্নী লক্ষ্মী ও সরস্বতী। বিষ্ণুর কল্যাণ রূপের মতো তাঁর পত্নীদ্বয়ও মানুষের কল্যাণ ও শুভাশুভের প্রতিরূপক। সর্বব্যাপী ধ্বংসের শেষে নজরুল সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা কামনা করেছেন। পরবর্তী উদ্ধৃতি (জ)-তে কবিতার প্রায় শেষপ্রান্তে বিদ্রোহী নিজেকে পরশুরামের কঠোর কুঠারের পৌরাণিক চিত্রকল্পে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। পরশুরামের কুঠার যেমন পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিল, কবির বিদ্রোহী বীরও একালের রক্তলোলুপ, মারণাস্ত্রের অধিকারী

যুদ্ধবাজদের ধ্বংস করে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করতে চান। আলোচ্য পুরাকাহিনী কবিদৃষ্টিতে নতুনভাবে প্রতিভাত ও ব্যাখ্যাত। বিদ্রোহী বলরাম স্কন্ধে হলের ন্যায় সমগ্র বিশ্বকে উৎপাটিত করতে চান ; তবে পুরাকাহিনীতে শুধুই উৎপাঁন : আর কবির ব্যাখ্যায় আছে নতুন সৃষ্টির মহানন্দে বিশ্বকে উৎপাটিত করার আকাঙ্ক্ষা। লক্ষ্মীর পিতা ধনুর্বিদ্যার প্রবর্তক ভৃগুকে অবলম্বন করে নজরুল মিথ প্রসঙ্গকে বর্তমানের সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। ভারতীয় পুরাণে ভগবান বিষ্ণু অবশ্য সৃষ্টির পালনকর্তা এবং কল্যাণময় দেবতা। কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতায় এ মিথ প্রসঙ্গটি প্রতিরূপকের গূঢ় অর্থে গ্রহণীয়। ভগবান এখানে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিরূপক এবং ভৃগুও কেবল দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষণ-কর্মে নিয়োজিত নন। 'খেয়ালি বিধির বক্ষ' বিদীর্ণ করার অভিপ্রায়ের মধ্য দিয়ে এ কবিতায় পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটেছে। উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায় এখানে ভগবানের প্রতিরূপকে উপাস্থাপিত । স্বাধীনতাকামী এবং দৃপ্ত পৌরুষের অধিকারী নজরুল ইসলাম পুরাণের আধুনিকতম প্রয়োগ করে 'বিদ্রোহী' কবিতাকে শিল্প সফল পরিণতি দিয়েছেন।[২৫]

কেবল কবিভাষার স্বাতন্ত্র্যেই নজরুল রবীন্দ্র আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি প্রবল এবং বিক্ষুব্ধ জলোচ্ছ্বাসের মতো। এ কবিতার মূল আবেদন যৌবনের অসম সাহসিকতার কাছে এবং তরুণ মনের আবেগোচ্ছ্বাসের কাছে। মানবচিত্তের চাঞ্চল্যের যে একটি ইতিহাস আছে, নজরুল ইসলাম তাকে পূর্ণভাবে আলোড়িত করেছিলেন। এ কার্যে নজরুল ইসলামকে সাহায্য করেছে তাঁর ছন্দ, চরণান্তে মিলের বৈচিত্র্য, প্রভূত সংখ্যক বিশেষ্যের সমাহার এবং অবশেষে শব্দ ব্যবহারে সর্বাংশে কবির দ্বিধাহীনতা।[২৬] 'সুইনবার্নের কবিতায় যেমন, তেমনি নজরুলের কবিতাতে শব্দ ও ছন্দ সতত প্রবহমান।'[২৭] — এবং মনে হয় ধ্বনি তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যেমন —

ক. বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর !

খ. আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি'।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।

শব্দকে নজরুল ইসলাম একটি প্রবল স্রোতোধারার মতো ব্যবহার করেছেন : এ ভঙ্গিকে ইউথ সিটওয়েল পর্বত শিখর থেকে নিম্নভূমিতে গড়িয়ে পড়ার ভঙ্গি বলে অভিহিত করেছেন।[২৮]

আবার কখনও কখনও তাঁর কবিতায় আবেগের চাপ সৃষ্টি হয়েছে শব্দের মধ্য দিয়ে। যেমন —

আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত- চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর !
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল ক'রে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তাঁর কাঁকন -চুড়ির কন-কন্।
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর !

এই স্তবকটি নির্মাণ করেছে এক ঐন্দ্রজালিক আবহ। শব্দের এমন নান্দনিক প্রয়োগ বাংলা কবিতায় কমই দেখা যায় । বিশেষ করে 'যৌবন ভীতু পল্লীবালা' আমাদের অভিজ্ঞতাকে এক চকিত মধুর সৌন্দর্যবোধে আলোড়িত করে। এ কেবল কবিতার মুহূর্তের উপলব্ধি হয়ে থাকেনি, সমগ্র বৈষ্ণব কবিতার কিশোরীকে যেন বর্তমানের ভেতরে সংস্থাপিত করে আমাদের ইতিহাস চেতনায় শিহরণ এনেছে। শব্দ এখানে কবিতার আবেগকে সঙ্গীতের দ্রুতগামিতা দান করেছে।[২৯]

শব্দচেতনায় 'সেকুল্যারাইজেশন' নজরুলের কবিসত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৩০] ভারতীয় পুরাণের নানা শব্দ ও চরিত্র তাঁর কবিতায় যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি সমগুরুত্বেই ব্যবহৃত হয়েছে পশ্চিম এশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গ— তৎসম, তদ্ভব শব্দের পাশেই শিল্প সার্থকতায় ব্যবহৃত হয়েছে আরবি-ফারসি শব্দ। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কখনও কখনও একই স্তবকে এমনকি একই চরণে ব্যবহৃত হয়েছে এই দ্বিবিধ উৎস থেকে চয়ন করা শব্দরাজি। যেমন—

আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!

এখানে সন্ন্যাসী, গৈরিক, বজ্র, ওঙ্কার, পিণাক-পাণি, ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড, চক্র, মহাশঙ্খ, প্রণব-নাদ প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে জৈব ঐক্যসূত্রে একাত্ম হয়ে গেছে বেদুঈন, চেঙ্গিস, কুর্নিশ, ইস্রাফিলের শিঙ্গা প্রভৃতি শব্দ।[৩১]

'বিদ্রোহী' কবিতার সূচনা 'বল বীর বল উন্নত মম শির' — এই ধ্রুব পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে। এ পঙ্‌ক্তি শুধু 'বিদ্রোহী' কবিতার মূল সুর নয় — 'অগ্নিবীণা' কাব্যেরও মূল সুর। কবিতার প্রথমেই 'বল' শব্দের দ্বিরুক্তি উদ্দীপিত করে বীরধর্মকে। আঙ্গিকগত দিক থেকে বলা চলে, নজরুল সম্ভবত 'বিদ্রোহী'কবিতা রচনাকালে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার আঙ্গিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।'[৩২] এছাড়া ওয়াল্ট হুইটম্যানের (১৮১৯-১৮৯২) Song of myself কবিতাটির আঙ্গিকগত কৌশল 'বিদ্রোহী' কবিতার আঙ্গিকে প্রভাব ফেলতে পারে।[৩৩] 'বিদ্রোহী' কবিতাটির ১৪১ চরণের মধ্যে 'আমি' সর্বনামটি ব্যবহৃত হয়েছে ১৪৭ বার — ১৪১ টি চরণের শুরু 'আমি' দিয়ে। এর মধ্যে ১০০ বারই চরণের বাকি অংশ থেকে 'আমি' শব্দটি একটু সরিয়ে রাখা যাতে পড়তে বা চোখের দেখার সময়ও পৃথক একটু জোর আসে। 'আমি' এবং 'আমি' অনুষঙ্গবাহী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ৬০ বার। কবিতার মূল ভাবকল্পনা এইভাবে 'আমি' শব্দের পুনরাবৃত্তিতে অনেকখানিই সার্থকভাবে ধরা পড়েছে। কবির এই 'আমি' অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের অন্তর্যামী-জীবনদেবতার মতো কিছু নয়। মোহিতলালের 'আমি' প্রবন্ধে আধুনিক, ইনডিভিজুয়ালাইজমের সঙ্গে বৈদান্তিক সোহমবাদের মিশ্ররূপ প্রকাশ পেয়েছে।[৩৪] নজরুলের যে অসংগত উত্তেজনা তথা প্রলয়-শক্তির আমন্ত্রণ তার জাত পৃথক। এমনকি 'আমার কৈফিয়ৎ' এর লৌকিক ও ব্যক্তিগত নজরুলের 'আমি' নয় এই 'আমি'। আসলে 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'আমি' বিশেষভাবে এ কবিতারই আমি, আমি-উচ্ছৃঙ্খল চিত্তবিস্ফোরণের নভোভেদী চিৎকার।[৩৫]

'বিদ্রোহী' কবিতায় বিদ্রোহের স্বরূপকে প্রকাশ করতে 'বিদ্রোহ' শব্দটি একবার ও 'বিদ্রোহী' শব্দটি সাতবার ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া 'চির' ও 'মহা' শব্দদুটির উপর্যুপরি ও বিচিত্র প্রয়োগ বিদ্রোহী কবিতাকে অনন্ত সময়ে প্রসৃত ভূগোলের মধ্যে সঞ্চালিত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত যে সত্য মূর্ত হয়েছে তা এই যে, নজরুল ইসলাম একাধারে 'চির-বিদ্রোহী' ও 'মহা-বিদ্রোহী'।[৩৬]

নজরুলের 'বিদ্রোহী' মনুষ্যসত্তার স্বরূপ সন্ধান ও উপলব্ধিমূলক রচনা। কবিতায় সমকালীনতার প্রকাশ নজরুলের বিষয় ও ভাষাবিন্যাসের সঙ্গে অন্তর্লীনভাবে জড়িত। মানুষের আত্মশক্তির জাগরণ এবং তার অনন্ত সম্ভাবনাকে উদ্বোধিত করাই তাঁর প্রতিভার মৌল বৈশিষ্ট্য। ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে মানুষকে তিনি স্থান দিয়েছেন। তাই তাঁর কাব্যে জাতীয়তা ও সর্বজাতিকবোধের সমন্বয় ঘটেছে, গণচেতনা ও গণমুক্তির তূর্যধ্বনি হয়েছে নিণাদিত। ধর্ম-বর্ণ-জাতি-সম্প্রদায়-ঊর্ধ্ব মানুষই ছিল তাঁর সৃজনক্রিয়ার অবলম্বন। 'বিদ্রোহী' কবিতার অসংখ্য চূর্ণ 'আমি' তাই শোষণ, পীড়ন ও স্বাধীনতা হরণ-বিরোধী বিশ্বমানবের প্রতিভূ।

তথ্যনির্দেশ :

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, কলকাতা, ৯ম প্রকাশ, ১৪০৯, পৃ. ২৯

২. আতাউর রহমান , নজরুলের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা, সম্পা. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ,*নজরুল সমীক্ষণ*, ঢাকা, ১৩৭৯, পৃ.

৩. নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *'অগ্নিবীণা'র* (মার্চ ১৯২২) অন্তর্ভুক্ত কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বিদ্রোহী'। কবিতাটি ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ৩/৪ সি তালতলা লেনের বাড়ির নিচ তলার ঘরে রচিত।

কবিতাটির প্রথম শ্রোতা মুজফ্ফর আহমদ তাঁর *'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা'* গ্রন্থে জানিয়েছেন '... নজরুল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমাকেই প্রথম পড়ে শোনাল। ...আমার মনে হয় নজরুল ইসলাম শেষরাত্রে ঘুম থেকে উঠে কবিতাটি লিখেছিল।' সেদিনই 'মোসলেম ভারত' ও 'বিজলী' পত্রিকা দুটির পক্ষ থেকে আফজালুল হক ও অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য নজরুলের কাছ থেকে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি নিয়ে যান। 'মোসলেম ভারত' অতি অনিয়মিত পত্রিকা বলেই অবিনাশচন্দ্রের অনুরোধে 'বিদ্রোহী' প্রথম প্রকাশিত হয়েছে 'বিজলী' পত্রিকার ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারি (২২শে পৌষ ১৩২৮) সংখ্যায়। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ১৯২১ সালের অক্টোবর-নভেম্বর (কার্তিক ১৩২৮) সংখ্যায় কবিতাটি পুনরায় প্রকাশিত হয়।'বিদ্রোহী' 'প্রবাসী' (মাঘ ১৩২৮), 'সাধনা' (বৈশাখ ১৩২৯), 'ধূমকেতু' (২২শে আগস্ট ১৩২২) প্রভৃতি পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়।

৪. 'বিদ্রোহী' কবিতা সম্পর্কে সমালোচকদের বিভিন্ন মতামত —

ক. 'নির্জীব দেশে এ কার বীর্যবাণী ? শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, সমগ্র দেশ প্রবল নাড়া খেয়ে জেগে উঠল। এমনটি কোনদিন শুনিনি, ভাবতেও পারিনি।' (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়', উদ্ধৃত : আবদুল মান্নান সৈয়দ, *নজরুল ইসলামঃ কালজ কালোত্তর*, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৫২)

খ. 'বাংলা সাহিত্যে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়ায় একবার কিন্তু এমনি তুফানের দুরন্ত দোলা লেগেছিল। সে দোলা যারা প্রত্যক্ষভাবে সেদিন অনুভব করেনি তাঁদের পক্ষে শুধু লিখিত বিবরণ পড়ে সে অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ স্বাদ পাওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়।' (প্রেমেন্দ্র মিত্র, *নজরুল সন্ধ্যা*, উদ্ধৃত : আবদুল মান্নান সৈয়দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১)

গ. " 'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে, মনে হল এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মনপ্রাণ যা কামনা করেছিল, যেন তাই ; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই যেন বাণী।" (বুদ্ধদেব বসু , *কালের পুতুল*, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ.১২৬)

ঘ. "'বিদ্রোহী' দেখবামাত্র নজরুলের ভেতরে আমি হুইটম্যান আর রবীন্দ্রনাথ দুজনকেই একসঙ্গে পাকড়াও করেছিলাম। তবুও বুঝে নিলাম লেখক বাপকা বেটা বটে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের পরবর্তী অন্যতম যুগ-প্রবর্তক বাঙ্গালীর বাচ্চা নজরুল।" (সাক্ষাৎকার : বিনয় সরকার, ৬ই জুন ১৯৪৩, *বিনয় সরকারের বৈঠকে*, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, ২০০৩, পৃ. ৩৯৯)

ঙ. " কবি কাজী নজরুল এছলামের মধ্যে খাঁটি কবি প্রতিভার উন্মেষ দেখিয়া আমরা বড়ই আশান্বিত হইয়াছিলাম। কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখিয়া তিনি আমাদিগকে একেবারে নিরাশ করিয়াছেন। (সৈয়দ এমদাদ আলী, বঙ্গ ভাষায় মোছলেম প্রভাব, *সোলতান*, ১৭ই ফাল্গুন ১৩৩০, উদ্ধৃত- ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, *নজরুল ইসলাম কবিমানস ও কবিতা*, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২১৯)

৫. মুজফ্ফর আহমদ, *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*, ঢাকা, পৃ. ১৯৫

৬. শনিবারের চিঠিতে 'আমি ব্যাঙ' কবিতাটি প্রকাশিত হলে তারই প্রতিক্রিয়ায় 'কল্লোল' পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৩১) নজরুল লেখেন 'সর্বনাশের ঘণ্টা'। মোহিতলাল মজুমদার শনিবারের চিঠিতে তার জবাব দেন 'দ্রোণগুরু' কবিতায়। (*নজরুল- রচনাবলী* , ১ম খণ্ড, সম্পা .আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৯১৫)।

৭. সুশীল কুমার গুপ্ত, *নজরুল চরিত মানস*, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ১৩৭

৮. কাজী নজরুল ইসলাম, মোরা সবাই স্বাধীন সবাই রাজা, *নজরুল রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭৩

৯. কাজী নজরুল ইসলাম, ধূমকেতুর পথ, *নজরুল রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৭

১০. কাজী নজরুল ইসলাম, রাজবন্দীর জবানবন্দী, *নজরুল রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২২

১১. কবীর চৌধুরী, নজরুল কাব্যে বিদ্রোহের স্বরূপ,সম্পা. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান , *নজরুল সমীক্ষণ*, ঢাকা, ১৩৭৯, পৃ. ১৫৫

১২. আতাউর রহমান, *কবি নজরুল*, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৪৫

১৩. কাজী আবদুল ওদুদ, কবি নজরুল ইসলাম, *নজরুল সমীক্ষণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪

১৪. সুশীলকুমার গুপ্ত, *নজরুল চরিত-মানস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

১৫. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৬

১৬. আজহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ৩৩

১৭. আজহারউদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৫

১৮. মুজফ্ফর আহমদ, পূর্বোক্ত

১৯. আবুল ফজল, নজরুল কাব্যে প্রেম, সম্পা. মীর আবুল হোসেন , *নজরুল সাহিত্য*, ৩য় সং, বৈশাখ, ১৩৭৭, পৃ. ৬১

২০. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, নজরুল ইসলাম ও রিনেসাঁস, *নজরুল সমীক্ষণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

২১. অজিত কুমার দত্ত, নজরুল কাব্যে পুরাণ, *নজরুল সমীক্ষণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬

২২. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ২০৩

২৩. মাহবুব সাদিক, মিথ-ঐতিহ্য চেতনা এবং নজরুলের কবিতা, *নজরুল সমীক্ষা*, নজরুল গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা , ১৯৯২, পৃ. ৩২

২৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *নজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা*, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২০৮

২৫. মাহবুব সাদিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

২৬. সৈয়দ আলী আহ্সান, নজরুল ইসলামের কবিতা:শব্দের অনুষঙ্গে, *নজরুল সমীক্ষণ*,পূর্বে পৃ. ২১২

২৭. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, দূরের, আবার কাছেরও, *একবিংশ* (নজরুল-জীবনানন্দ সংখ্যা), আগস্ট, ২০০০,পৃ. ৪৭

২৮. সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত

২৯. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, নজরুল কাব্যে শব্দ ব্যবহার : আবেগ উদ্দীপনার অনুষঙ্গ, *নজরুল সমীক্ষণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪

৩০. বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ.

৩১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৩২. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, *নজরুল ইসলাম : কবিমানস ও কবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯৪

৩৩. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত পৃ.১৯৪

৩৪. ক্ষেত্র গুপ্ত, *নজরুলের কবিতা : অসংযমের শিল্প*, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৭

৩৫. ক্ষেত্র গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

৩৬. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *নজরুল ইসলাম : কালজ ও কালোত্তর*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩